গৃহবধূদের সন্তুষ্টির মাত্রা ও হার বিপরীত মুখী সম্পর্কে সম্পর্কিত। অধ্যাপক আহুজা মন্তব্য করেছেন ঃ "Level of satisfaction with housework varies inversely with age, education and income."

জনবিন্যাস ও ভারতীয় নারী

ভারতে জনবিন্যাস বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে নারী অবদমনের বিষয়টি স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ভোগবাদী পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রাধান্য এখনও অনস্বীকার্য। এ ধরনের সমাজব্যবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত বিবেচিত হয়। প্রাসঙ্গিক সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization) এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (Indian Medical Association) ভারতে জনবিন্যাস সম্পর্কিত সামাজিক সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। এই সমীক্ষার প্রতিবেদন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতে কন্যাভ্রূণ ও শিশুকন্যা হত্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে। এবং নির্দয় ও নির্বিচারে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতিবছর কন্যাভ্রূণ হত্যার সংখ্যা গড়ে কুড়ি লক্ষ। স্বভাবতই বর্তমান ভারতে নারী-পুরুষের অনুপাত অতিমাত্রায় আশঙ্কাজনক। ব্রিটিশ আমলে এই অনুপাত যা ছিল, স্বাধীন ভারতে তা আরও নিম্নমুখী। Indian Medical Association-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ব্রিটিশ আমলে ১৯০১ সালে ভারতবর্ষে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা যেখানে ছিল ৯৭২, স্বাধীন ভারতে ১৯৯১সালে, নব্বই বছরের ব্যবধানে, তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৯২৭; সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষকদের আশঙ্কা এই অনুপাত বর্তমানে আরও নীচে নেমে গেছে।

আবার ভারতের সকল প্রদেশে এই অনুপাত এক রকম নয়। যে সমস্ত অঙ্গরাজ্যে নারী অবদমনের হার ও মাত্রা অধিক বা যে সমস্ত রাজ্যে নারী হীনতর অবস্থায় অবস্থিত, সেই সমস্ত অঙ্গরাজ্যেই আনুপাতিক বিচারে পুরুষের থেকে নারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কম। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র কেরলের জনবিন্যাসগত পরিসংখ্যান এক্ষেত্রে সন্তোষজনক এবং উন্নত দেশসমূহের পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনাযোগ্য। ভারতের যে সমস্ত অঙ্গরাজ্য অনেকাংশে সামন্ততান্ত্রিক প্রকৃতির এবং অনগ্রসর, সেই সমস্ত অঙ্গরাজ্যের জনবিন্যাসগত পরিস্থিতি হতাশাজনক। এই সমস্ত রাজ্যের অনুপাতিক বিচারে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশ কম।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কন্যাসন্তানকে এখনও বোঝা হিসাবে অবজ্ঞা করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি অত্যাধুনিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা (amnicentesis)-র কল্যাণে মাতৃগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়। স্বভাবতই কন্যা-ভ্রূণ নষ্ট করা হচ্ছে ব্যাপক হারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী একমাত্র মুম্বাই শহরেই ১৯৮৪ সালে চল্লিশ হাজার কন্যা-ভ্রূণ নষ্ট করা হয়েছে। শিশু কন্যা হত্যার বিষয়টিও অবহেলাযোগ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারণে কন্যাসন্তানের অপমৃত্যু ঘটে। প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে বছরে পুত্রসন্তানের থেকে তিনলক্ষ অধিক কন্যাসন্তানের মৃত্যু ঘটে শিশু অবস্থায়।

কর্মক্ষেত্র, শ্রম ও ভারতীয় নারী

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারী-অবদমন ও নারীর হীনতর অবস্থানের একটি বড় কারণ হল আর্থনীতিক ক্ষেত্রে নারীর স্বনির্ভরতার অভাব। ভারতে বিভিন্ন কাজকর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক প্রকৃতিই হল কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গগত বৈষম্যের মূল কারণ। আধুনিককালের কর্মক্ষেত্র উৎপাদনমুখী। এ রকম উৎপাদনশীল কাজকর্মে পুরুষদের নিয়োগের ব্যাপারে এক ধরনের স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব পরিলক্ষিত হয়। ভারতের বর্তমান সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমূলক নীতি সম্পর্কিত চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৯ ধারায় একই কাজের জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমমজুরীর কথা বলা হয়েছে। সমমজুরী সম্পর্কিত আইনও প্রণীত হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও পরিস্থিতির মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কর্মক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে নারী শ্রমিক কম পারিশ্রমিক পায়। অবশ্য আনুষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রগুলির কথা আলাদা। সাধারণভাবে বলা যায় যে নারী শ্রমিক অধিক মাত্রায় শোষিত হয়। পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের জায়া ও জননীর ভূমিকায় এবং গার্হস্থ্য কর্ম, সন্তান প্রতিপালন ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর এই সমস্ত কাজকর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। কারণ মহিলাদের গৃহকর্মের সঙ্গে আর্থনীতিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কহীন। ভারতে আদমসুমারীর বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কেবলমাত্র তাঁরাই শ্রমিক হিসাবে পরিগণিত হন যাঁরা আর্থনীতিক উৎপাদন কর্মের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। এই উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে নারী যোগসূত্রহীন। এই কারণে সাধারণভাবে ঘরকন্যার কাজকর্মে নিযুক্ত মহিলাদের গৃহবধূ হিসাবে গণ্য করা হয়, শ্রমিক হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। এই মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতে নারী শ্রমিকের হিসাব হল শতকরা

কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষে বৈষম্য

২৮.৫৭। কিন্তু এই হিসাব বাস্তব চিত্রকে প্রতিফলিত করে না। কারণ এই বিচার-বিবেচনার বাইরে বহু নারীশ্রমিক বর্তমান। এই কারণে এ বিষয়ে ভারতের জনগণনা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের বিস্তর গরমিল পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সাম্প্রতিককালে সম্পাদিত একটি সমীক্ষা সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের নারীশ্রমিক হল মোট শ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশ।

সাম্প্রতিককালে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে মহিলারা পরিবারের পরিধির বাইরে এসে বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত হচ্ছে। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির মাত্র শতকরা তের ভাগ (১৩.০) ছিল নারীশ্রমিক। ১৯৯১ সালের জনগণনায় নারীশ্রমিকের সংখ্যা শতকরা হিসাবে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৮.৫৭। তবে নারীশ্রমিকের সিংহভাগ, অর্থাৎ প্রায় আশি শতাংশ কৃষিমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য প্রশাসনিক কৃত্যকসমূহে এবং সরকারী উদ্যোগসমূহের মোট শ্রমশক্তির মাত্র বার শতাংশ হল মহিলা। তা ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও ক্ষমতার পরিকাঠামো থেকে মহিলাদের কার্যত বাইরে রাখা হয়েছে। ভারতে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে মহিলাদের এই পশ্চাদ্‌পদ অবস্থানের জন্য কতকগুলি কারণ দায়ী বলে মনে করা হয়। এই কারণগুলি হল নিরক্ষরতা, সমাজব্যবস্থায় অবদমিত অবস্থান, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাব প্রভৃতি। প্রাপ্ত একটি পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতে মোট নারীশ্রমিকের শতকরা ৫২.৫৯ জন নিরক্ষর; শতকরা ২৮.৫৬ জনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের স্কুল শিক্ষা আছে ; উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কুল শিক্ষা আছে ১৩.৭৮ শতাংশের এবং স্নাতক ও উচ্চতর শিক্ষা আছে মাত্র ৫.০৭ শতাংশের। আবার শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য নিরীখে গ্রামাঞ্চলের নারীশ্রমিকের শিক্ষার হার ও মান হতাশাজনক। ভারতে মহিলারা শ্রমশক্তির বাজারে হাজির হয় নানা কারণে। তবে অর্থের অভাবই হল মূল কারণ। অন্যান্য কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ পতির কম পারিশ্রমিক, স্বামীর শারীরিক অসামর্থ্য, পতি-পরিত্যক্তা বা পতির কাছ থেকে অন্ন-বস্ত্র না পাওয়া, অসহায় বিধবা অবস্থা প্রভৃতি। তবে প্রায় নব্বই শতাংশ মহিলাই আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদে নারীশ্রমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮১ সালের সামাজিক কল্যাণ পরিসংখ্যান (Social Welfare Statistics, 1981) সূত্রে এই পরিসংখ্যান প্রাপ্ত।

নারীশ্রমিকের হিসাব ও অবস্থা সন্তোষজনক নয়

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় কাজকর্ম সম্পাদনের দায়-দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত অসাম্য-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। যাবতীয় গার্হস্থ্য কাজকর্মের দায়িত্ব অবধারিতভাবে মহিলাদের উপর বর্তায়। ঘরের কাজকর্মে গৃহভৃত্য নিয়োগ করার মত আর্থিক সামর্থ্য অধিকাংশ পরিবারেরই থাকে না। স্বভাবতই রান্নাবান্না, সন্তান প্রতিপালন, ঘরদোর সাফাই, পোষাক-আশাক পরিষ্কার করা প্রভৃতি পরিবারের অভ্যন্তরের সর্ববিধ কাজকর্ম মহিলাদেরই সম্পাদন করতে হয়। এই সমস্ত কাজকর্মে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যায় না। কারণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ধারণা অনুসারে গৃহকর্মে নারীর সঙ্গে পুরুষ হাত লাগালে তা উপহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। অনেক মহিলাকে বৃত্তিগত কাজকর্মে বা চাকরি-বাকরির প্রয়োজনে বাড়ীর বাইরে দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতে হয়। তারপর বাড়ী ফিরে তারা ঘরের কাজকর্মে হাত লাগাবে পরিবারের মানুষজন তাই আশা করেন। চাকরিরত অনেক মহিলার পক্ষে তা শারীরিকভাবে সম্ভব হয় না। তাঁদের গঞ্জনা শুনতে হয়। বাড়ীতে এ নিয়ে অশান্তি হয়। সংশ্লিষ্ট মহিলারাও অনেক ক্ষেত্রে অশান্তি ও অপরাধবোধে ভোগেন। নিম্নবর্গের বা শ্রেণীর মহিলাদের উপর কাজকর্মের চাপ আরও বেশী। এ রকম পরিবারের মহিলাদের সংসারের আর্থনীতিক দায়-দায়িত্ব বহুলাংশে বহন করতে হয়। চাষ-আবাদের কাজে তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আবার কামার-কুমোর-তাঁতি প্রভৃতি কারিগর পরিবারের মহিলারাও পারিবারিক পেশাগত কাজকর্মে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। হিন্দু সমাজব্যবস্থায় সাবেকি ধারা অনুসারে জাতিগত পেশায় মহিলাদের ভূমিকা বা দায়-দায়িত্ব নির্ধারিত থাকে। সুতরাং পরিবারের মোট আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবারের মহিলা সদস্যদের অবদানের ফল।

কাজকর্মে লিঙ্গগত বৈষম্য

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। বিষয়টি উচ্চ বর্গের বা শ্রেণীর পরিবারসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমাজের উঁচুতলায় পুরুষ-কর্তৃত্বের বিষয়টি বিশেষভাবে বর্তমান। পরিবারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব পুরুষ বহন করে। এই কারণে এ রকম পরিবারে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্প্রতিককালে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেছে। উঁচুতলার অনেক পরিবারের মহিলারা এখন অর্থকরী চাকরী-বাকরি করছেন। মহিলাদের এই উপার্জনের সুবাদে সংসারের আর্থিক সঙ্গতি ও সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিককালে সভ্য জীবন যাপনের খরচ বেড়েছে বহুগুণ। এই খরচ সামাল দেওয়া শুধুমাত্র পুরুষের উপার্জনে আর সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক কারণে পুরুষশাসিত ভারতীয় সমাজে বহির্জগতের বিভিন্ন পেশায় মহিলাদের নিয়মিত এই উপার্জনকে স্বীকার ও সমর্থন করতে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অন্যত্র। পত্নীর উপার্জন পতির উপার্জনের থেকে বেশী হলে পুরুষের পৌরুষ বিপন্নবোধ করে; অহংবোধ আহত হয়। স্ত্রীর উপার্জনে সংসার চালাতে পুরুষের আত্মসম্মানে

পুরুষশাসিত সমাজে আঘাত

আঘাত লাগে। পিতৃতান্ত্রিক ও পুরুষ-শাসিত সমাজব্যবস্থার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির বিরোধ বাধে। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বনির্ভরতা পুরুষশাসিত সমাজ সচ্ছন্দে মেনে নিতে পারে না। অথচ পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে করারও কিছু থাকে না। বস্তুত বর্তমানের বিকাশমান সামাজিক রূপচিত্র পুরুষশাষিত সমাজব্যবস্থার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সাবেককালের পুরুষ-কর্তৃত্বমূলক সামাজিক জীবনধারার জের বর্তমানেও পর্যাপ্ত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। এ রকম এক টানাপোড়নের মধ্যে সমাজ বদলাচ্ছে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করছে। কিন্তু এই সামঞ্জস্য সাধনের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর গতির। এই কারণে এনিয়ে মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর উত্তেজনারও সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্যামাচরণ দুবে (S. C. Dube)-র মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। *Indian Society* শীর্ষক গ্রন্থে অধ্যাপক দুবে বলেছেন ঃ "Men dominate, but women also have ways of getting things done according to their desires and wishes.....The emerging ethos does not favour patriarchy, but the hangover of the past is often unrelenting. Society is adapting itself to the altered scenario, even if the pace of adaptation is very slow."

আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার হার ও মান মোটেই সন্তোষজনক নয়। পিতার ও পতির সম্পত্তিতে মহিলাদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকাংশ মহিলাই অবহিত নয়। মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ মহিলা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করে। এই সংখ্যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আবার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করে এমন মহিলার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। এ রকম মহিলার সংখ্যা অর্ধ শতাংশের অধিক হবে না। কারণ পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পর্কে অবহিত মহিলার সংখ্যা নিতান্তই কম। বিপরীতক্রমে স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সম্পর্কে অবহিত মহিলার সংখ্যা বেশ ভালই।

গ্রামাঞ্চলে কর্মরত ও রোজগার করা এবং আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর মহিলার সংখ্যা বেশ কম, এক-দশমাংশের মত। আবার সামগ্রিক বিচারে নিজেদের কাজের মজুরীর ব্যাপারে অধিকাংশ মহিলাই অসন্তুষ্ট। কাজের প্রকৃতি ও পারিশ্রমিকের পরিমাণ নিয়েই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। মহিলাদের অনেকেরই আয় পারিবারিক আয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। অধিকাংশ মহিলাই নিজেদের রোজগারের অর্থকে খুশীমত খরচ করতে পারেন না। কর্মরত মহিলাদের ঘরের বাইরেও কাজের বোঝা বহন করতে হয়। কিন্তু ঘর-গৃহস্থালীর কাজকর্মের ব্যাপারে অন্যান্য মহিলাদের মতই সমান সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। নিজেদের অধিকার সম্পর্কে মহিলাদের সচেতনতা ও অবগতির অভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক আহুজা (Ram Ahuja) তাঁর *Indian Social System* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ "The main barriers in the awareness of rights are : illiteracy, excessive involvement in domestic chores, household constraints (that is, attitudes of husband and in-laws), and economic dependence on males."

ধর্ম ও ভারতীয় নারী

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় মহিলাদের সামাজিকীকরণের ফলশ্রুতি হিসাবে মহিলাদের মানসিকতায় ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শহরাঞ্চলের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের উপর পশ্চিমী মূল্যবোধের অল্পবিস্তর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। এতদ্‌সত্ত্বেও নগরবাসী মহিলাদের মানসিকতায়ও আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অপরদিকে গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তাচেতনার আধিক্য সুবিদিত। সমাজজীবনে নারীকে অবদমিত রাখার ক্ষেত্রে সাবেকি ও নব্য পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা সাহায্য করে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই সমস্ত ধ্যান-ধারণার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে ধর্মের সাহায্য-সহযোগিতায়। ধর্মশাস্ত্রসমূহে দুর্বিনীত নারীকে শাস্তি বিধানের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিকতার অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা ধর্মশাস্ত্রসমূহে পাওয়া যায়। পুরুষের প্রাধান্য বা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অধিকাংশ ধর্মমতে স্বীকার ও সমর্থন করা হয়েছে। এইভাবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে অবদমিত করার উদ্যোগ-আয়োজন পরিলক্ষিত হয়।

ধর্ম ও নারীর অবদমন

ধর্মের দোহাই দিয়ে নারী নির্যাতনের নিষ্ঠুর উদাহরণ হল সতীদাহ প্রথা। প্রয়াত পতির চিতায় সদ্য বিধবার সহমরণের ব্যবস্থা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সহকারে সম্পাদিত হয়। স্বামী চিতায় সহমরণের মাহাত্ম্য ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এখনও একেবার অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়নি। ১৯৮৮ সালে রাজস্থানের দেওরালায় 'রূপ কানোয়ার'-এর ঘটনা হল এমনই এক ধর্মীয় আবেগ-তাড়িত মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনাটি মর্মান্তিক কিন্তু ধর্মীয় হওয়ার কারণে স্পর্শকাতর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'সতীদাহ' প্রথার পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সমাজের একদল মানুষ 'সতীপ্রথা'র সমর্থনে বিবিধ ধর্মীয় যুক্তি প্রদর্শন করেন। ভারতীয় সমাজে এখনও বিধবাদের তেমন মর্যাদা দেওয়া হয় না। বেশ কিছু সামাজিক আচার-

সতীপ্রথা